

ব্যাংকিং এর ইতিহাস

Asif Adnan

February 8, 2019

17 MIN READ

আচ্ছা বলুন তো, ব্যাংকের কাজটা কী? ব্যাংক আসলে কী করে? কাউকে যদি অল্প কথায় ব্যাংকিং কী- বোঝাতে যান, তাহলে কী বলবেন?

ব্যাংক সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে টাকা নেয়। তারপর এ টাকা থেকে কিছু নিজের কাছে রেখে বাকি টাকা সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদ নেয় আর সঞ্চয়কারীকে সুদ দেয়। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজে সুদের একটা অংশ রাখে।

তাই তো?

ব্যাংকিং বলতে অধিকাংশ মানুষ এ জিনিসটাকেই বোঝে। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ব্যাংকিং এর ব্যাপারে বিভিন্ন মত, ফতোয়া ইত্যাদি দেয়া হয়। যেমন অনেকেই হয়ত এমন ফতোয়া শুনে থাকবেন যে – সুদি ব্যাংকে টাকা রাখা হারাম। কারণ ব্যাংক আপনার এই টাকা কাউকে ঋণ দিয়ে, বা এই টাকা খাটিয়ে সুদ খাবে। আপনার টাকা ব্যবহার করে ব্যাংক সুদ খাবে তাই সুদি ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না।

অর্থাৎ ব্যাংক হল একটা আর্থিক মধ্যস্থতাকারী, financial intermediary। সে সঞ্চয়কারী আর ঋণগ্রহীতার মধ্যে মিডলম্যান হিসেবে কাজ করে। উপমহাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতির ব্যাপারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মাওলানা তাকী উসমানীও ব্যাংকিং এর ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করেন। যেমন তিনি বলেছেন,

‘ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের অর্থ একত্র করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অন্যান্য দরকারি ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করে। [তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা (অনুবাদ : আবু সালেহ মুহাম্মাদ তোহা, আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩), পৃষ্ঠা : ১০৬]

“...সাধারণভাবে ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চয়কে একত্র করে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সরবরাহ করে...” [তাকী উসমানী, গাইরে সুদী ব্যাংকারি’। বঙ্গানুবাদ, ‘ইসলামী ফিক্বহের আলোকে সুদবিহীন ব্যাংকিং আপত্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা’ (মাওলানা মুসা বিন ইয়হার, মাকতাবাতুল ইসলাম), পৃষ্ঠা : ৪১]]

‘(ব্যাংক) মানুষের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সঞ্চয়কে একত্র করে সেগুলোকে শিল্প ব্যবসায় ব্যবহার করার মাধ্যম হওয়া... ব্যাংকের অবস্থান শুধু এমন একটি প্রতিষ্ঠানের, যা টাকার লেনদেন করে।’ [তাকী উসমানী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, (অনুবাদ : আবু সালেহ মুহাম্মাদ তোহা, আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩), পৃষ্ঠা : ১২১]

অর্থাৎ মাওলানা তাকী উসমানীসহ ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা ব্যাংকের ইসলামীকরণ, ‘শরীয়াহসম্মত’ ব্যাংকিং এর যে ধারণাগুলো দিয়েছেন সেগুলো গড়ে উঠেছে ব্যাংকিং এর ব্যাপারে এই ধারণার ওপর। **ব্যাংক একটা ফাইন্যানশিয়াল ইন্টারমিডিয়েরি বা মিডলম্যান - এটা একটা মৌলিক স্তম্ভ যার ওপর ইসলামী ব্যাংকিং এর পুরো কনসেপ্ট দাঁড়িয়ে আছে।**

কিন্তু বাস্তবতা হল ব্যাংক আসলে এ কাজটা করেই না। আপনার অ্যাকাউন্টে রাখার সঞ্চয়ের সাথে ব্যাংকের দেয়া লোনের

কোন সম্পর্কই নেই। তাহলে ব্যাংক কিভাবে লোন দেয়? সেই আলোচনায় আমরা যাবো তবে তার আগে আমাদের তাকাতে হবে ব্যাংকিং এর ইতিহাসের দিকে।

নিচে ‘ইসলামী ব্যাংকিং - ভুল প্রশ্নের ভুল জবাব’ [ড. মুহাম্মাদ যাহিদ সিদ্দিকী মুঘল, [Ilmhouse Publication](#) (প্রকাশিতব্য)] বইয়ের একটি অধ্যায়ের আলোচনা তুলে ধরা হল যেখানে ব্যাংকিং এর ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাংকিং এর ইতিহাস

প্রচলিত ব্যাংকিং-ব্যবস্থাকে তার ঐতিহাসিক ভ্রান্তির আলোকে বোঝা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, ইসলামী ব্যাংকসহ আজকের সব ধরনের ব্যাংকিং-ব্যবস্থা সেই ঐতিহাসিক মিথ্যা এবং প্রতারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা মধ্যযুগে মহাজনেরা ইউরোপের খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে করত। ব্যাংকিং-ব্যবস্থার অগ্রগতিকে আমরা কয়েক ধাপে (stages) ভাগ করে বোঝার চেষ্টা করব। উল্লেখ্য, এই বিভক্তি বাস্তবিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে করা হয়নি শুধু বোঝানোর সুবিধার জন্য করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে সমস্ত ধাপ এই ধারাবাহিকতায় এসেছে কি না সেটা ভিন্ন বিষয়।

প্রথম ধাপ

ইউরোপের মানুষ নিরাপত্তার জন্য সোনা-রুপা ইত্যাদি (প্রকৃত অর্থ) আমানত হিসেবে স্বর্ণকার ও মুদ্রা ব্যবসায়ীদের কাছে জমা রাখত। ব্যাংকিং-ব্যবস্থার প্রথম ধাপের শুরু এখান থেকেই। এসব আমানত রাখা হতো নিরাপত্তা এবং ভ্রমণের সময় সুবিধার জন্য। স্বর্ণকাররা এর বদলে আমানতদারদের নামে রসিদ লিখে দিত। এই রসিদ হলো প্রমাণ যে, রসিদে উল্লেখিত ব্যক্তি এত পরিমাণ স্বর্ণের মালিক, সে যখন চায় রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণকারের কাছ থেকে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। প্রাথমিক অবস্থায় এসব রসিদকে সম্পদ কিংবা আসল অর্থ মনে করা হতো না; বরং ঋণের রসিদ (debt receipts or promise of payment) হিসেবেই দেখা হতো।

দ্বিতীয় ধাপ

ধীরে ধীরে ইউরোপে এসব রসিদের ব্যবহার ও এর ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকল। একসময় প্রতিবার ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণ বের করে আনার বদলে মানুষ সরাসরি এই রসিদকেই কেনাবেচায় বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিল। এ ব্যাপারটা ভালোমতো বোঝা প্রয়োজন। একসময় এসব কাগজকে শুধু ঋণের রসিদ ভাবা হতো। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে এগুলো স্বর্ণের বিকল্প বিনিময়যোগ্য বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু হলো। আর এখান থেকেই সমস্ত সমস্যার শুরু।

তৃতীয় ধাপ

স্বর্ণকাররা যখন দেখল যে, সোনা কিংবা রুপার বদলে রসিদ দিয়েই মানুষ লেনদেন সেরে ফেলছে এবং দৈনন্দিক লেনদেনে স্বর্ণের ব্যবহার খুব কমই হচ্ছে, তখন তারা নতুন এক বুদ্ধি বের করল। স্বর্ণ জমা রাখার পাশাপাশি এবার তারা ঋণ দেয়াও শুরু করল। তাদের কাছে আমানত হিসেবে থাকা স্বর্ণগুলো তারা সুদের বিনিময়ে মানুষকে ধার দিয়ে পয়সা কামানো শুরু করে দিল। তবে যে পরিমাণ স্বর্ণের রসিদ বিভিন্ন আমানতদারদের দেয়া হয়েছে তার কিছু অংশ সব সময় স্বর্ণকারদের কাছে রাখতে হতো। যাতে করে কেউ হঠাৎ তার স্বর্ণ নিতে আসলে তৎক্ষণাৎ তাকে সেটা ফিরিয়ে দেয়া যায়। এ পর্যায়ে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটল। **স্বর্ণের বদলে জারি করা ঋণের রসিদ এবং হুবহু সেই এক স্বর্ণ একই সাথে বিনিময়যোগ্য বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করল। আর এর মাধ্যমে ইউরোপীয় এ স্বর্ণকাররা নিজেদের অজান্তেই গোপনে অর্থনীতিতে অর্থের জোগান (Money Supply) বাড়ানোর ভূমিকা পালন করতে শুরু করল।**

ধরুন, স্বর্ণকারদের কাছে সব মিলিয়ে মোট ১০০ গ্রাম স্বর্ণ জমা রাখা হলো। যার বদলে জারি করে দেয়া হলো ১০০ রসিদ (১টি

রসিদ = এক গ্রাম স্বর্ণ)। এখন স্বর্ণকাররা যদি গোপনে বিভিন্ন লোককে ৫০ গ্রাম স্বর্ণ সুদি ঋণ হিসেবে দেয়, তাহলে একদিকে ঋণদাতারা ১০০ রসিদ (অর্থাৎ ১০০ গ্রাম স্বর্ণ) বিনিময়যোগ্য বস্তু হিসেবে ব্যবহার করছে, অপরদিকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নেয়া লোকেরা ৫০ গ্রাম স্বর্ণও ব্যবহার করছে। এভাবে অর্থনীতিতে স্বর্ণের মোট জোগান ১০০ থেকে বেড়ে ১৫০ গ্রাম হয়ে গেল। **ঠিক এ অবস্থা থেকেই ব্যাংকের জন্ম, এই অর্থে যে ব্যাংকের মূল কাজ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (financial intermediary) বা মিডলম্যান হিসেবে কাজ করা না; বরং এভাবে স্বর্ণকারদের মতো শূন্য থেকে অর্থ তৈরি করা।** অন্যভাবে বলতে গেলে, ঋণের রসিদ (promise of payment) আর মানুষের মধ্যকার পারস্পারিক চুক্তিতে (private contact) সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা স্বতন্ত্রভাবে লেনদেনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ঋণের রসিদগুলো একধরনের মুদ্রা (কারেন্সি) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চতুর্থ ধাপ

এ প্রবণতা দিন দিন বাড়তেই থাকল। মানুষ স্বর্ণকারদের কাছে আরও বেশি করে স্বর্ণ জমা রাখতে শুরু করল। একসময় স্বর্ণকাররা দেখল আমানতদাররা মোট রসিদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের (২০ পার্সেন্ট ধরা যেতে পারে) চেয়ে বেশি স্বর্ণ কখনোই ফিরিয়ে নেয় না। এমনকি তারা জারিকৃত রসিদ দিয়ে ঋণের আদান-প্রদানকেও মেনে নিয়েছে। কারণ, তারা জানত, সমাজের প্রায় সবাই এসব রসিদের মাধ্যমে কেনাবেচা করতে রাজি। এমন অবস্থায় স্বর্ণকাররা পুরো ব্যাপারটা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিল। যারা নতুন ঋণ চাইতে এল তাদের স্বর্ণের বদলে রসিদ দিয়েই তারা সুদি ঋণ দিতে শুরু করল। আর যেহেতু মানুষ রসিদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণই স্বর্ণই উঠিয়ে নিত তাই জমাকৃত স্বর্ণের চেয়ে বেশি রসিদ জারি করতে কোনো সমস্যা নেই। স্বর্ণকাররা এবার তা-ই করা শুরু করল।

ধরুন, স্বর্ণকারদের কাছে মোট ১০০ গ্রাম স্বর্ণ জমা রাখা হলো। অন্যদিকে স্বর্ণকাররা আগের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত হলো যে আমানতদাররা প্রচলিত রসিদের ২০ পার্সেন্টের বেশি স্বর্ণ কখনোই তুলে নেয় না। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণকাররা হিসেবে করে দেখল তারা চাইলে ১০০ গ্রাম স্বর্ণ নিজেদের কাছে রেখে ৫০০ রসিদ (৫০০ এর ২০ পার্সেন্ট হলো ১০০) বানাতে পারবে। এখনো কিন্তু ১টি রসিদ ১ গ্রাম স্বর্ণের সমান বলেই চালানো হচ্ছে। (যেন ১০০ গ্রাম স্বর্ণ ৫০০ রসিদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট। বিস্তারিত সামনে আসবে) গভীরভাবে ভাবুন ৫০০ রসিদের মধ্যে মাত্র ১০০টির বদলে দেয়ার মতো স্বর্ণ অর্থনীতিতে আছে। বাকি ৪০০ ঋণের রসিদ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে, যার বিনিময়ে দেয়ার মতো স্বর্ণ স্বর্ণকারদের কাছে নেই।

প্রাথমিক পর্যায়ে যখন প্রতিটি রসিদের ভিত্তি হিসেবে স্বর্ণ ছিল তখন লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করা এই রসিদগুলো সত্যিকার দাবি ও প্রতিশ্রুতি ছিল (factual claim and true promise of payment)। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে লেনদেনে এতটাই পরিবর্তন এল যে এখন এ রসিদগুলো কাল্পনিক ও মিথ্যা দাবির প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হলো (fictitious claim and false promise of payment), যা পূরণ করা কার্যত অসম্ভব। কারণ, ১০০ গ্রাম স্বর্ণ দিয়ে ৫০০ রসিদের বিনিময় পরিশোধ করা কখনো সম্ভব না। স্বর্ণকারদের এই পুরো মডেলের ভিত্তি ছিল তাদের এই বিশ্বাস যে মানুষ কখনোই মোট রসিদের সমান স্বর্ণ ফেরত চাইবে না। যেদিন তারা এমনটা করে বসবে, সেদিনই তাদের প্রতারণা ফাঁস হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসতে পারে। ব্যাংক কেন রসিদ লিখে সেগুলোকে ঋণ হিসেবে দিয়ে তারপর সুদ কামানোর এই লম্বা প্রক্রিয়াতে যাচ্ছে? এর বদলে কেন তারা সরাসরি সেসব রসিদ দিয়ে পণ্য ও সার্ভিস কেনা শুরু করল না? এটা আসলে করা যাবে না। কারণ, এমন করা হলে পণ্য বা সার্ভিস যার কাছ থেকে কেনা হচ্ছে সে এই রসিদগুলোর বিনিময়ে স্বর্ণ চেয়ে বসতে পারে। কিন্তু স্বর্ণকার (ব্যাংক) এর কাছে তো এই স্বর্ণের অস্তিত্বই নেই। যেহেতু এভাবে রসিদ ব্যবহার করলে সেটা ঘুরেফিরে স্বর্ণকারের কাছেই আসবে এবং মানুষ তার কাছে স্বর্ণ চাইবে, তাই স্বর্ণকারের জন্য নিজের তৈরি রসিদ ব্যবহার করা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো।

স্বর্ণকারের জন্য দরকার ছিল রসিদগুলো (যা অর্থের মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে) সুদি ঋণ হিসেবে দেয়া। এর সুবিধা হলো, রসিদের মাধ্যমে নেয়া ঋণ যখন রসিদের মাধ্যমেই ফিরিয়ে দেয়া হতো, তখন জন্ম নেয়া কৃত্রিম অর্থ এমনভাবেই শেষ হয়ে যেত

এবং এর কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকত না। এই ফাঁকে স্বর্ণকার সুদ থেকে নিজের লাভ কামিয়ে নিত। একই কারণে স্বর্ণকারের জন্য অংশীদারির ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে বৈধভাবে ব্যবসা করাও সম্ভব ছিল না। কারণ, তার কারবার আগে থেকেই বিশাল এক ঝুঁকির মধ্যে আছে। সে প্রকৃত অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি কৃত্রিম অর্থ তৈরি করেছে। এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা তার জন্য অসম্ভব। এমন অবস্থায় অংশীদারির ব্যবসায় ঢোকার অর্থ নিজের কারবারকে আবারও ঝুঁকিতে ফেলা। স্বর্ণকার বা ব্যাংক যদি সত্যিকারের কোনো অংশীদারি ব্যবসায় টাকা খাটায় এবং লোকসান হয়, তাহলে তাকে এই লোকসানের দায়িত্ব নিতে হবে এবং স্বর্ণ দিয়েই তা পরিশোধ করতে হবে। এ জন্য ব্যাংক এত ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে সুদি ঋণ দেয়, যার দ্বারা একদিকে তাদের লাভ নিশ্চিত হয় অন্যদিকে নিজের টাকাও নিরাপদ থাকে। নিজের দেয়া ঋণের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক ঋণের বরাবর অন্য কোনো পণ্য জমা রাখার শর্তও দিয়ে থাকে। এভাবে তারা এক নিরাপদ ও সংরক্ষিত কারবার চালিয়ে যাচ্ছে[1]।

এভাবে ব্যাংকিং ইউরোপে অত্যন্ত লাভজনক একটি ব্যবসায় পরিণত হলো। রসিদ বা কৃত্রিম অর্থ বানিয়ে স্বর্ণকাররা দু-হাতে পয়সা কামাচ্ছিল। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে অন্যান্য ধান্দাবাজ লোকেরাও এই ব্যবসায় নেমে গেল। এই পর্যায়ে এসে ঋণদাতার নামের (bearer's name) বদলে তারা নিজেদের নামে ঋণের রসিদকে জারি করা শুরু করল, যাতে করে রসিদের গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়ে যায়। (বর্তমান রাষ্ট্রের নোটের মতো, যার ওপর পরিশোধকারীর নাম থাকে না, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম থাকে) এই ব্যবসার প্রসার এবং রসিদের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ঋণের ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ (debt money) বাড়তে থাকল এবং ক্রমান্বয়ে সমাজ স্বর্ণকারদের (প্রাচীন ব্যাংক) কাছে ঋণী হতে শুরু করল। কারণ, ব্যাংকের রসিদগুলো নিশ্চিতভাবেই কারও না কারও ওপর ঋণ হয়ে যায়।

যেমনটা ওপরে স্পষ্ট করা হয়েছে প্রচলিত রসিদের মোট পরিমাণের কিছু পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষণ করা ব্যাংকের জন্য জরুরি। যাতে করে মানুষের স্বর্ণের (বর্তমান যুগের পরিভাষায় ক্যাশ) স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করা যায়। কিন্তু ব্যাংক থেকে ঋণের রসিদের বদলে স্বর্ণ উঠানোর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে ব্যাংক বিপদে পড়ে যাবে। আমানতদারদের স্বর্ণের এ চাহিদা পূরণের জন্য এক ব্যাংককে তখন অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে স্বর্ণ ঋণ করতে হবে। ইউরোপ-অ্যামেরিকায় ১৮ এবং ১৯ শতকের দিকে এমন কিছু ঘটনার সন্ধান পাওয়া যেগুলোকে 'Note Wars' বলা হয়। এক ব্যাংক তার প্রতিপক্ষ ব্যাংকের অনেকগুলো রসিদ একসাথে নিয়ে একই দিনে পরিশোধ করার জন্য উপস্থাপন করত, যাতে সে দেওলিয়া হয়ে যায় এবং প্রতিযোগিতার মাঠ খালি হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হলো, এ ধাপেই ইউরোপে সুদের শাস্ত্রীয় বৈধতা এমনকি ধর্মীয় বিকল্প তৈরির প্রবণতা ব্যাপক হতে শুরু করল। যা থেকে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সুদের বৈধতা এবং বিকল্পের খোঁজার বিষয়টি ব্যাংকিং এর প্রসার ব্যাপক হবার পর জন্ম নিয়েছে, কোনো শাস্ত্রীয় কিংবা স্বাভাবিক ধারাতে না। চিন্তার বিষয় হলো, বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং এর নামে যেভাবে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর ইসলামীকরণ করা হচ্ছে, প্রায় একই ভাবে কয়েক শতাব্দী আগে খ্রিস্টীয় ইউরোপে 'ধর্ম সংস্কার' (reform) এর স্লোগানদাতা হযরতরাও একই কাজ করেছেন। আরও মজার ব্যাপার হলো, দুই শ্রেণির পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং দলিলের মাঝে মিল অভাবনীয়।[2]

পঞ্চম ধাপ

এই ধাপে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বেড়িয়ে ব্যাংকিং-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে আবির্ভূত হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে। ঠিক কীভাবে কার্যক্রম এতটা ব্যাপকতা অর্জন করে তা নিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন ধরনের উত্তর দিয়ে থাকেন। নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ, যারা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে স্বাভাবিক চাহিদা ও লেনদেনের উন্নতির ফসল বলে দাবি করেন, তাদের মতে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা ও আচরণের মাধ্যমে ব্যাংকিং-ব্যবস্থার এরূপ প্রসার ঘটে। তাদের মতে ব্যাংকিং-ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে সামগ্রিক ক্ষতি থেকে একে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু মূলনীতি ও নিয়ম (rules and regulations) আবিষ্কার ও সেগুলোর বাস্তবায়নের। আর সঠিকভাবে এই কাজ করা কেবল সরকারের অধীনেই সম্ভব। তাদের

মতে, এই প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ যেভাবে অন্যান্য পুঁজিবাদী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পলিসি তৈরি করে তেমনিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক পলিসি (monetary policy) তৈরি করা। কিন্তু এই ‘স্বাভাবিক অগ্রগতির’ ব্যাখ্যা ইতিহাস সমর্থন করে না।

অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের ধারণা অনুযায়ী[3] ইউরোপের জাতীয়তাবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো যখন নিজেদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর এসব যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, এ যুদ্ধগুলোর খরচ দেয়া রাষ্ট্রের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। এ বিশাল খরচ জোগানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল জনগণের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ট্যাক্স আদায় করা। কিন্তু যুদ্ধ-কবলিত জনগণের জন্য এই ট্যাক্সের ভার নেয়া অসম্ভব ছিল। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানরা বড় বড় ব্যাংকগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং ব্যাংকের রসিদগুলোকে সরকারি নোটে পরিবর্তন করে আরও নোট ছাপিয়ে যুদ্ধের খরচ জোগাল।[4] এভাবে মিথ্যা ও প্রতারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকিং-ব্যবস্থাকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হলো। আগে যে প্রতারণা এবং যুলুম সাধারণ ব্যাংকাররা ব্যক্তিগত পর্যায়ে করত, এখন সেটাকে দেয়া হলো রাষ্ট্রীয় রূপ। প্রাথমিক অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ছাপানো এসব নোটগুলোর মোট পরিমাণের কিছু অংশের সমান স্বর্ণ জমা রাখা জরুরি মনে করা হতো। কিন্তু কালের পরিক্রমায় অবস্থা এই দাঁড়াল যে, যেটাকে সরকারি নোট বলা হয় সেটা কেবল আইনগত মুদ্রায় (legal tender) পরিণত হলো। এর বিপরীতে দেয়ার মতো স্বর্ণ বা অন্য কোনো পণ্য বা দ্রব্য রইল না।

অর্থাৎ সরকারি এই নোট, কেবল ‘ঋণের রসিদ’ যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক চালু করেছে সরকারের সামরিক খরচসহ অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এ জন্যই আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিতে বিনিময়-নির্ভর (barter) অর্থনীতি মনে করেন না; বরং একে Credit economy এর গণ্য করা হয়। বিনিময়-নির্ভর অর্থনীতি (barter economy) হলো এমন অর্থনীতি, যেখানে কোনো পণ্যের লেনদেন সমপরিমাণ বস্তুর বিনিময়ে হয়। আর এর জন্য জরুরি হলো যে বস্তুকে বিনিময় কিংবা অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হবে সে ‘আসল মূল্যমান’ (token value) এর বস্তু হতে হবে। যেমন : স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি[5]।

প্রচলিত ব্যাংকিং-ব্যবস্থা মূলত সেই একই মিথ্যা এবং ধোঁকার ওপরই প্রতিষ্ঠিত, যা আগেকার ইউরোপীয় স্বর্ণকাররা সাধারণ মানুষের সাথে করত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আগেকার দিকে এটাকে প্রতারণা মনে করা হতো, আর এখন একে আইনি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তবে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আইনগত স্বীকৃতির কারণে কোনো বাতিল কাজ ‘হক’ হয়ে যায় না। যদি সব মানুষ আজ জমাকৃত টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংকের দরজায় করাঘাত করে, তাহলে আজও ব্যাংকের এই মিথ্যা ও প্রতারণা সূর্যের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সারমর্ম :

আলোচনা নিয়ে অগ্রসর হবার আগে এখনো পর্যন্ত এ বইয়ের আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরছি :

- ব্যাংককে একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (financial intermediary) বা মিডলম্যান মনে করা ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।
- সত্যিকারভাবে ব্যাংকে অর্থের লেনদেন করে না; বরং অর্থ উৎপাদনের কাজ করে।
- ব্যাংকে যেই ক্রয়-ক্ষমতা ও মুদ্রা তৈরি করে সেটা তৈরি হয় ঋণের মাধ্যমে। এ জন্য প্রচলিত মুদ্রাকে Debt money (ঋণ-নির্ভর মুদ্রা) বলা হয়।
- কোনো ব্যাংকের ঋণ তার সঞ্চয়ের সমান হওয়া অসম্ভব।

- ব্যাংক ডিপোজিট থেকে ঋণ দেয় না; বরং উল্টো ঋণের মাধ্যমে ডিপোজিট অস্তিত্বে আসে।
- ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো বিনিময়হীন ঋণের (created out of nothing) ওপরর সুদ (ইসলামী ব্যাংকের ভাষায় 'মুনাফা') কামানো।
- ব্যাংক মূলত মিথ্যা, প্রতারণা এবং ছলনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হলো মিথ্যা ও ছলনার ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থাকে নিরাপদ পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য পলিসি তৈরি করা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নোটের প্রচলন করে, সেটা কেবল ঋণের রসিদ (promise of payment)।
- ঋণের এই রসিদগুলো এই অর্থে কৃত্রিম যে, এর বিপরীতে আদায়যোগ্য কোনো পণ্য (সোনা, রূপা, তামা বা অন্য কিছু) থাকে না।

* * *

[ওপরের আলোচনা নেয়া হয়েছে 'ইসলামী ব্যাংক - ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর' বইয়ের 'ব্যাংকিং ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' অধ্যায় থেকে]

আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগ্রহী পাঠক বইটি কিনতে পারেন নিচের লিঙ্ক থেকে -

<https://www.wafilife.com/shop/books/islami-bank-vul-proshner-vul-uttor/>

<https://www.rokomari.com/book/182445/islami-bank--vul-proshner-vul-uttor>

* * *

আরো দেখুন

অনেকের কাছে ওপরের কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। এবং এমন মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক না। কারণ এ সত্য হজম করা বেশ কঠিন। একারণে আমি আরো কিছু তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিচ্ছি যেখান থেকে আগ্রহী পাঠক ওপরের কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারবেন।

১) ব্যাংকিং ব্যবস্থার এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে জানার জন্য দেখুন, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Joseph A. Schumpeter এর বই Theory Of Economic Development, Chap 3, part 1।

২) খোদ ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছে। দেখুন ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক - The Bank of England এর স্বীকারোক্তি - Money Creation In The Modern Economy, McLeay, Radia and Thomas; Bank Of England, Quaterly Bulletin 2014, Q1.

ডাউনলোড লিংক - <https://bit.ly/2CeUIQR>

সহজ ব্যাখ্যার জন্য দেখতে পারেন - The truth is out: money is just an IOU, and the banks are rolling in it, Graeber, The Guardian, March 2014. লিংক - <https://bit.ly/2aGnjxm>

৩) দেখুন আইএমএফ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল/International Monetary Fund) এর একজন অর্থনীতিবিদ ও একজন

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের বক্তব্য - Where does money come from?

৪) বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক সিনিয়র অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হেরমান ডেইলির বক্তব্য -

পুরো ভিডিওর জন্য দেখুন - Four Horsemen - <https://www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU>

৫) ইসলামী ব্যাংকিং, বন্ড এবং ফাইন্যান্স নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা তারেক আল-দিওয়ানির বক্তব্য

প্রবন্ধ - Fractional Reserve Banking,

http://www.islamic-finance.com/item1_f.htm (হাইলি রেকোমেন্ডেড)

6) ওপরে যা বলা হয়েছে তা বুঝতে সমস্যা হলে দেখতে পারেন নিচের ভিডিওটির ৯.৫৭ সেকেন্ড পর্যন্ত

Money As Debt -



এ ব্যাংকিং এবং ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন-

ইসলামী ব্যাংকিং - ভুল প্রণেয় ভুল উত্তর (প্রকাশিতব্য)

মূল - মুহাম্মাদ যাহিদ সিদ্দিকী মুঘল

অনুবাদ - ইফতেখার সিফাত

সম্পাদনা - আসিফ আদনান

মূল্য - ২১০ ট

প্রকাশনী - Ilmhouse Publication

* * *

ফুটনোট

[1] এর ফলে সম্পদ বণ্টন কাঠামোতে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। কারণ, এভাবে ঋণের কারণে সম্পদের স্রোত সেসব ধনীদেব দিকে চলে গেছে, যারা ঋণ নেয়ার সময় ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি সম্পদ বন্ধক বা জামানত রাখতে পারবে। ব্যাংকিং-ব্যবস্থার এই পলিসিকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়, ‘ব্যাংক আপনাকে তখনই ঋণ প্রদান করবে, যখন আপনি প্রমাণ করবেন যে, আপনার ঋণের কোনো প্রয়োজন নেই।’ বর্তমানের যুগের অতিরিক্ত সুদ এবং অসম বণ্টন মূলত সেই যুলুমের ফলাফল, যাকে শতাব্দী যাবৎ ব্যাংকিংয়ের নামে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন বানিয়ে মানুষের ওপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে। আফসোস হলো, ইসলামী ব্যাংকিং এর বৈধতাদানকারীরা এই যুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার বদলে সেই ব্যাংকিংয়ে অংশ নিতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

[2] বিস্তারিত জানার জন্য Richard Tawney এর বই Religion And The Rise of Capitalism দেখতে পারেন। (বিশেষত The Continental Reformers অধ্যায়)

[3] দেখুন : The Political Economy of Central Banking, by Malcolm Sawyer

[4] Bank Of England প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দেখলে পাঠক বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।)

[5] Barter Economy, Monetary Economy, Credit Economy এগুলোর পার্থক্য বোঝার জন্য দেখুন : Augusto

